অর্থ মন্ত্রণালয়

বাৎসরিক বাজেট

২০০১–০২

বাজেট বক্তৃতা

শাহ্ এ এম এস কিবরিয়া

অর্থমন্ত্রী

(প্রথম পর্ব)

ঢাকা

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৮ বাংলা

৭ই জুন, ২০০১ ইংরেজী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় স্পীকার,

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুসারে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বাজেট ও ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

২। এ বাজেট বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর আগে বাংলাদেশে কোন সংসদই তার মেয়াদকালে ছয়টি বাজেট পাশ করার সুযোগ লাভ করেনি। ষষ্ঠ বাজেট অনুমোদন করে সপ্তম সংসদ দেশে নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার একটি লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত রেখে যাবে। জাতীয় সংসদে পর পর ছয়টি বাজেট উপস্থাপনের বিরল সুযোগ লাভ করে আমি পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার কাছে শোকর আদায় করছি। সাথে সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই জাতির জনকের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। তাঁর দিক নির্দেশনা, গতিশীল নেতৃত্ব ও অসাধারন রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলেই আমার পক্ষে গত পাঁচ বছর ধরে এ গুরু দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

৩। আজ ৭ই জুন। এই দিনেই বাঙ্গালী জাতির মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসে সূচিত হয়েছিল এক যুগান্তকারী নতুন অধ্যায়। ছয় দফা দাবির ঘোষণা আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনে প্রথম বিপ্লবী পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই ঐতিহাসিক দিনে মহান সংসদে বাজেট উপস্থাপন করতে গিয়ে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের ইতিহাসের মহানায়ক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বাঙ্গালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নব নির্মাণ, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদ, বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতি-রাষ্ট্র এবং আত্ম-পরিচয় প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ছিল অদ্বিতীয় ও সর্বব্যাপ্ত। দুর্ভাগ্যবশত হত্যাকারীরা বুঝতে পারেনি যে তারা বাঙ্গালী হৃদয়ের কোমলতম স্থলে কঠোরতম আঘাত করেছে; বুঝতে পারেনি তাদের অপরাধের জঘণ্যতা। নৃশংস ঘাতকরা জানত না যে তাদের শানিত অস্ত্র বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠকে কোনদিনই স্তব্ধ করতে পারবে না; তাঁর বজ্রকণ্ঠ চিরকাল স্বাধীন বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হবে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্পন্দিত হবে। তাই ইতিহাসবিকৃতকারীদের দু'দশক ব্যাপী পরিকল্পিত অপচেষ্টা সত্ত্বেও বাঙ্গালী জাতির রাজনৈতিক আদর্শ, অর্থনৈতিক মুক্তি, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মুক্ত চিন্তার ঋদ্ধি - প্রতিটি ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শণ আজ আমাদের দিক নির্দেশনা দিচ্ছে ও প্রেরণা যোগাচ্ছে। চিরদিনই তিনি থাকবেন বাঙালী জাতির সকল কীর্তির ও প্রেরণার মর্মমূলে। বস্তুত মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, ধ্যান-ধারনা এবং চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রতিটি বাঙ্গালী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সেই দিনের জন্য যখন বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের বিচারের রায় কার্যকর হবে এবং আমাদের ইতিহাসের এক কলংকিত অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটবে। গত বছর ১১ই জুন আমার বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম যে, এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত

করতে হলে এই বিচার প্রক্রিয়া অবিলম্বে সমাপ্ত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত স্বাধীনতা বিরোধী অশুভ চক্র এই বিচার কার্য বিঘ্নিত করার জন্য এখনও ধ্বংসাত্মক অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন জাতির বিবেক স্বস্তি পাবে তখনই যখন বিচারের রায় কার্যকর করা হবে।

৪। পরম শ্রদ্ধার সাথে আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ, শহীদ মনসুর আলী এবং শহীদ কামরুজ্জামানকে। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের অবদান জাতি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। জাতীয় চার নেতার নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। দেশবাসী অধীর আগ্রহে এই বিচার প্রক্রিয়ার দ্রুত সমাপ্তি কামনা করছে। আমি বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা, স্মরণ করছি ত্রিশ লাখ শহীদের এবং দু'লাখ নির্যাতিতা মা-বোনের ত্যাগের কথা। বাঙ্গালী জাতির মুক্তির ইতিহাসে তাঁদের অবদান চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত শিখা চিরন্তন এবং নির্মাণাধীন স্বাধীনতার আলোক স্তম্ভ স্বাধীন বাঙ্গালী জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতীক রূপে যুগ যুগ ধরে দেদীপ্যমান থাকবে।

মাননীয় স্পীকার,

৫। আমি মাননীয় সংসদ সদস্যদের সপ্তম সংসদের শুরুতেই ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের বাজেটে যে বক্তব্য রেখেছিলাম তা আজ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি তখন মহান সংসদের মাধ্যমে জাতিকে জানিয়েছিলাম, ''সাবেক সরকার আমাদের একটি প্রায় স্থবির ও ক্ষণভঙ্গুর অর্থনীতি দিয়ে গেছেন''। উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তমান সরকার লাভ করেছিল কৃষি খাতে স্থবিরতা, খাদ্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা, অত্যাবশ্যক বিনিয়োগের অভাবে বিধ্বস্ত বিদ্যুৎ খাত, বহির্বাণিজ্যে বিপুল ঘাটতি, আর্থিক খাতে নৈরাজ্য ও ব্যাপক প্রতারণা, জবাবদিহিতাহীন অস্বচ্ছ প্রশাসন ব্যবস্থা এবং হতোদ্যম বেসরকারী খাত। বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমি ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম, ''আজকে সরকারের সম্মুখে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো একটি মন্থর অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করে প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করা''। সপ্তম সংসদের প্রদোষকালে দাঁড়িয়ে আমি এই মহান সংসদকে আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, একটি সমস্যা-জর্জরিত অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করার যে অঙ্গীকার আমি করেছিলাম গত পাঁচ বছরে আমরা তা সাফল্যের সাথে পূর্ণ করেছি। সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুসারে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে স্থির মূল্যে (১৯৯৫-৯৬ ভিত্তি বছর) বাংলাদেশে স্থূল জাতীয় উৎপাদের প্রবৃদ্ধির হার ৬.০৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বি,এন,পি সরকারের আমলে ব্যবহৃত প্রাক্কলন পদ্ধতি (১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরকে ভিত্তি বছর ধরে) অনুসারে এই হার দাঁড়ায় ৬.৬ শতাংশে। গত পাঁচ বছরে নতুন প্রাক্কলন পদ্ধতি অনুসারে স্থূল জাতীয় উৎপাদের বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার হল ৫.৩৫ শতাংশ। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিতে ধ্বস ও ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে শতাব্দীর দীর্ঘতম ও প্রলয়ংকরী বন্যা সত্ত্বেও এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। প্রতিতুলনায় ১৯৯১-৯২ হতে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত সময়কালে সাবেক সরকারের শাসন আমলে বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৫ শতাংশ। মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই সাফল্য আরো সুস্পষ্ট।

১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের স্থির মূল্যে বি,এন,পি সরকারের আমলে পাঁচ বছরে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় গড়ে প্রতি মাসে মাত্র ২৮ টাকা হারে বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, বর্তমান সরকারের শাসনকালে গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় গড়ে একই স্থির মূল্যে প্রতি মাসে বেড়েছে ৪৮ টাকা।

মাননীয় স্পীকার,

৬। উল্লেখ্য যে, বর্তমান প্রবৃদ্ধির সাথে সাবেক সরকারের আমলের প্রবৃদ্ধি তুলনা করতে হলে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর ভিত্তিক নতুন পদ্ধতির চেয়ে ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছর ভিত্তিক পুরাতন পদ্ধতির প্রাক্কলন অধিকতর নির্ভরযোগ্য, কেননা ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের পূর্বে জাতীয় উৎপাদের প্রবৃদ্ধি পুরাতন পদ্ধতিতেই প্রাক্কলন করা হত। যদি সাবেক সরকারের আমলে ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুসারে জাতীয় উৎপাদের প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয় তবে গত পাঁচ বছরে বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৫.৮৩ শতাংশে, যা নতুন পদ্ধতিতে মাত্র ৫.৩৫ শতাংশে প্রাক্কলন করা হয়েছে। পুরাতন পদ্ধতির প্রাক্কলন অনুসারে স্থিরমূল্যে ১৯৮৫-৮৬ হতে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর সময়কালে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় বাড়ে মাত্র ২৩.১ শতাংশ; ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০০-২০০১ সময়কালে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ২৪.৩ শতাংশ। অর্থাৎ বিগত সরকারদের আমলে দীর্ঘ দশ বছরে মাথাপিছু আয় যে পরিমান বেড়েছে বর্তমান সরকারের পাঁচ বছর শাসনকালে তার চেয়ে বেশি বেড়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

৭। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি উন্নয়নের জন্য নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়, কিন্তু যথেষ্ট নয়। সম্পদের সুষম বন্টন ও সামাজিক বিচার নিশ্চিত না করা হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমাজের জন্য সব সময় সুফল বয়ে আনে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক হিসাবে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই উৎসাহিত করেনি, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্কলন অনুসারে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক অসাম্যের সূচক (Gini Coefficient) ছিল ৪২ শতাংশ; ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে এ সূচক ৩৬ শতাংশে নেমে এসেছে। অনুরূপভাবে শহরাঞ্চলে অসাম্যের সূচক ৪৯ শতাংশ হতে ৪৩ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। মাথা গণনার সূচকের (Headcount Index) ভিত্তিতে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্রের হার ছিল ৪৭.৯ শতাংশ, ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে এই হার ৪৪.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। সাম্প্রতিক দুই বছরে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র আরো দ্রুততর হারে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশে প্রত্যাশিত গড় আয়ু (জন্মলগ্নে) ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে ছিল ৫৮.৭ বছর। সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুসারে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে গড় আয়ু ৬১.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। গত পাঁচ বছরে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমানও বেড়েছে। এপ্রিল ১৯৯৬ হতে মে ১৯৯৯ সময়কালে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমান গ্রামাঞ্চলে ২২০৬.১ কিলো ক্যালরি হতে ২২৭৪.২ কিলো ক্যালরিতে এবং শহরাঞ্চলে ২২২০.২ কিলো ক্যালরি হতে ২২৮৮.৩ কিলো ক্যালরিতে উন্নীত হয়েছে।

যেহেতু সরকারের কর্মকান্ডের সুফল প্রত্যক্ষভাবে দরিদ্র জনগণের কাছে পৌছানো সম্ভব হয়েছে সেহেতু গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়ের চেয়েও দ্রুততর হারে সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী সামাজিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য প্রধানত মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) ও মানব দারিদ্র সূচক (Human Poverty Index) ব্যবহার করে থাকে। উভয় সূচকের প্রাথমিক প্রাক্কলন হতে দেখা যাচ্ছে যে গত পাঁচ বছরে মানব উন্নয়ন ক্ষেত্রে লক্ষণীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ১৯৯৫-৯৭ হতে ১৯৯৮-৯৯ সময়কালে বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন সূচক ৪২.৬ শতাংশ হতে ৪৮.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। উপরন্তু ১৯৯৫-৯৭ হতে ১৯৯৮-২০০০ সময়কালে মানব দারিদ্র সূচক ৪১.৬ শতাংশ হতে ৩৪.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। সামগ্রিক বিশ্লেষণে এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির শুধু পরিমাণগত বৃদ্ধিই ঘটেনি, গুণগত পরিবর্তনও ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুনিপুণ নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের শাসন আমলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য বয়ে এনেছে নতুন জীবনের আস্বাদ ও নিশ্চিত করেছে তাঁদের ক্ষমতার তাৎপর্যময় সম্প্রসারণ।

মাননীয় স্পীকার,

৮। বিগত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির সাথে সামাজিক ন্যায়বিচারের শুভ মেলবন্ধন বাজারের অদৃশ্য হাত সৃষ্টি করেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অনুসৃত নীতি ও কৌশলের ফলেই এ ধরনের প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। এ কৌশলের পাঁচটি উপাদান লক্ষণীয়। প্রথমত, কৃষি খাতে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, ন্যায়বিচারের স্বার্থে দুস্থ জনগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও উদ্ভাবনমূলক দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়ন। তৃতীয়ত, দ্রুত মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। চতুর্থত, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা অর্জন। সর্বোপরি বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সংস্কার সাধন। আমি এখন গত পাঁচ বছরে এসব নীতির বাস্তবায়ন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

মাননীয় স্পীকার,

৯। কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই জরুরী নয়, সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্যও অত্যাবশ্যক। কৃষির বর্ধিত উৎপাদন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে ও দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। উপরন্তু এর ফলে বিদেশের উপর নির্ভরশীলতাও কমে আসে। দুর্ভাগ্যবশত অতীতে অপ্রতুল বিনিয়োগ ও সরকারের অবহেলার ফলে কৃষিখাতে স্থবিরতা বিরাজ করছিল। সাবেক বি,এন,পি সরকারের পাঁচ বছরের শাসন আমলে কৃষি খাতে বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি গড়ে অর্ধেক শতাংশেরও (০.৫%) কম ছিল। বস্তুতঃ কৃষি ও কৃষকদের দুঃসময়ের এই পাঁচ বছরের মধ্যে দুই বছর কৃষি খাতে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। প্রতিতুলনায় শেখ হাসিনার সরকারের পাঁচ বছরে কৃষি খাতে বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার (স্থির মূল্যে) হলো ৪.২ শতাংশ। সাবেক সরকারের শাসন আমলের তুলনায় কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার আট গুণেরও বেশি বেড়ে গেছে। বর্তমান সরকার যখন দায়িত্ব

গ্রহণ করে তখন দেশে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল প্রায় ১.৯ কোটি মেট্রিক টন। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের নতুন রেকর্ড ২.৬৪ কোটি মেট্রিক টন ছাড়িয়ে যাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন কমপক্ষে ৭৪ লক্ষ টন বেড়েছে। ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বছরে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল প্রায় ১.৩০ কোটি টন। ১৯৭৫-৭৬ হতে ১৯৯৫-৯৬ সময়কালে বিশ বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ৬০ লক্ষ টন। পূর্ববর্তী সরকাররা বিশ বছরে কৃষি খাতে যে পরিমাণ উৎপাদন বাড়াতে পেরেছে তার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন আমরা পাঁচ বছরে অর্জন করেছি।

১০। বর্তমান সরকার কর্তৃক ন্যায্যমূল্যে ও যথাসময়ে উপকরণ সরবরাহ ও কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের ফলেই কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তণ সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত সরকার কর্তৃক কৃষি উপকরণ সরবরাহে ব্যর্থতা ও সার্বিকভাবে কৃষি খাতকে অবহেলা করার জন্যই কৃষি ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। সারের দাবি করতে গিয়ে বি,এন,পি সরকারের শাসন আমলে ১৮ জন কৃষককে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। ভর্তুকি সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের জন্য দাতাদের কাছে বিগত সরকারদের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বর্তমান সরকার সকল চাপ উপেক্ষা করে দেশের স্বার্থে গত পাঁচ বছর ধরে সারের জন্য প্রত্যক্ষ ভর্তুকি বহাল রেখেছে। গত পাঁচ বছরে রাজস্ব বাজেটে সারের জন্য মোট ৫১১ কোটি টাকার ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে সেচ যন্ত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও ডিজেলের জন্য উচ্চ হারে প্রচ্ছন্ন ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে সেচযন্ত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন ভর্তুকির হার হল ২৬.৪ শতাংশ ও ডিজেলের ক্ষেত্রে ছিল ২৭ শতাংশ। সেচযন্ত্র, পাওয়ার টিলার ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির উপর আমদানী শুল্ক প্রত্যাহার করে কৃষিতে যন্ত্রায়ন উৎসাহিত করা হয়েছে। কৃষি ঋণের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বি,এন,পি সরকারের শাসন আমলে গড়ে বছরে ১১৯৫ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রথম চার বছরে বিতরণ করা হয়েছে বছরে ২৩৯৫ কোটি টাকা যা পূর্বতন সরকারের গড় বিতরণের দ্বিগুনেরও বেশি। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে প্রাতিষ্ঠানিক খাত হতে বিতরণকৃত কৃষি ঋণের পরিমান ছিল ৩২৪৫ কোটি টাকা। উপরন্তু ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর হতে কৃষি ঋণের সুবিধা বর্গা চাষীদের কাছে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। খাদ্যশস্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য সরকার অভ্যন্তরীন বাজার হতে সংগ্রহের পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে। ১৯৯৫ সালে সরকারের অভ্যন্তরীন খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমান ছিল ২ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টন। ২০০০ সালে এ সংগ্রহের পরিমান ১০ লক্ষ ৪৭ হাজার টনে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৫ সালে কুইন্টাল প্রতি গমের অভ্যন্তরীন সংগ্রহ মূল্য ছিল ৭৫০ টাকা, ২০০০ সালে তা ৮৯০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৮.৬ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। অনুরূপভাবে বোরোর সংগ্রহ মূল্য ১৫ শতাংশ ও আমনের সংগ্রহ মূল্য প্রায় ১৪ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর সাফল্যের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাজার শোকর আদায় করছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি বাংলার নিবেদিতপ্রাণ চাষী ভাইদের যাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকারের প্রতিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে দায়িত্ব পালন করে এই বিরল ও গৌরবজনক সাফল্য অর্জন করেছে।

মাননীয় স্পীকার,

১১। বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের হতদরিদ্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বাজারের পরোক্ষ প্রভাব এ নিশ্চল অচলায়তনে কোন সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত পূর্বতন সরকারসমূহের দারিদ্র নিরসন সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট দিগ্‌দর্শণ ছিল না। তাই দারিদ্র নিরসনে তাদের আগ্রহ বা সাফল্যের কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায় না। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ত্রাণ প্রকল্প ও বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প ছাড়া পূর্ববর্তী সরকারসমূহের দারিদ্র নিরসনের জন্য কোন বিস্তৃত কর্মসূচী ছিল না। বাংলাদেশে দারিদ্র যেমন ব্যাপক তেমনি জটিল। এখানে সর্বত্র দারিদ্র একই ধরনের নয়। বাংলাদেশে রয়েছে দারিদ্রের বহু রূপ যাদের উৎস, প্রকৃতি ও সমাধান ভিন্ন। বর্তমান সরকার তাই ভিন্ন ভিন্ন দরিদ্র গোষ্ঠীর জন্য পৃথক কর্মসূচী গ্রহন করেছে।

১২। প্রথমত, এ দেশে অনেক হতদরিদ্র রয়েছে যাদের পক্ষে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছাড়া দারিদ্রের দুষ্টচক্র হতে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের আগে এ দেশে বয়োবৃদ্ধদের জন্য কোন সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর হতে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী চালু করা হয়। এ কর্মসূচীর অধীনে ৪ লাখেরও বেশি বয়োবৃদ্ধদের মাসে নিয়মিত ১০০ টাকা হারে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর হতে একটি নতুন কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রায় ২ লক্ষ দুস্থ, অসহায়, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুণর্বাসনের জন্য ১০ কোটি টাকা প্রাথমিক অনুদান নিয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন স্থাপন করা হয়েছে। অসহায় বয়োবৃদ্ধদের আশ্রয় ও শুশ্রূষার জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ছয়টি শান্তি নিবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উপরন্তু পাঁচ কোটি টাকার বরাদ্দ নিয়ে নির্যাতিতা, দুস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ধরনের হতদরিদ্রদের জন্য পূর্বতন সরকারগণ কোন অর্থবহ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

১৩। দ্বিতীয়ত, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ন সমস্যা সরকারী কর্মসূচীতে ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দরিদ্রদের জন্য দু ধরনের গৃহায়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যে সব হতদরিদ্রের আদৌ কোন ভিটে নেই তাদের গৃহায়ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে আশ্রয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ কর্মসূচীর আওতায় প্রায় ২৯ হাজার হতদরিদ্র গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং এদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১৭.২ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু এই কর্মসূচীর অধীনে অতিরিক্ত ১৮ হাজার গৃহ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। যে সব দরিদ্র ব্যক্তির ভিটে আছে অথচ উপযুক্ত ঘর নেই তাদের জন্য গৃহায়ন তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই কর্মসূচীর আওতায় ৩৩ হাজার পরিবারের গৃহ নির্মাণের জন্য ৬৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে; এর মধ্যে সাড়ে আঠার হাজার গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতি সহজ শর্তে গৃহ ঋণের ব্যবস্থা ইতোপূর্বে কোন সরকার করেনি। বস্তুত দেশের দরিদ্র গৃহহীনদের সাহায্যের জন্য এ সব প্রকল্প বাস্তবায়ন করে শেখ হাসিনার সরকার জনসেবা ও সুশাসনের নতুন মান স্থাপন করেছে।

১৪। উপরন্তু, বর্তমান সরকার বিদ্যমান দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীসমূহকে ঢেলে সাজিয়ে সম্প্রসারন ও সুসংহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে প্রয়োজনীয় খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ত্রাণের জন্য খাদ্য সাহায্য, অসহায় জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও উন্নয়নের জন্য কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারন করা হয়েছে। ১৯৯১-৯২ হতে ১৯৯৫-৯৬ সময়কালে এ সব কর্মসূচীতে গড়ে বছরে ৮.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০০-২০০১ সময়কালে বছরে গড়ে খাদ্যশস্য বিতরনের পরিমাণ হল ১২.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমান সরকারের আমলে খাদ্যশস্য বিতরণ প্রায় ৪৭ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে এবং এর অর্থায়ন করা হয়েছে প্রধানত সরকারের নিজস্ব অর্থ হতে।

১৫। বর্তমান সরকার একদিকে নতুন আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প চালু করে, অন্যদিকে বিদ্যমান ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীসমূহের সম্প্রসারন করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রাম বাংলার প্রতিটি পরিবারকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান অব্যবহৃত সম্পদ ব্যবহার করে প্রতিটি বাড়িকে উন্নত আত্ম-নির্ভরশীল খামারে রূপান্তরের লক্ষ্যে ‘‘একটি বাড়ী একটি খামার’’ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪১ কোটি টাকা। আমরা আশা করছি যে এই যুগান্তরকারী কর্মসূচী একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়ে গ্রামীণ জনজীবনে একটি নীরব বিপ্লবের সূচনা করবে। দেশে বেকার যুবকদের লাভজনক ও উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ হতে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই ব্যাংক প্রায় ১২ হাজার শিক্ষিত বেকার যুবককে ৪০ কোটি টাকার ঋণ বরাদ্দ করেছে। এই ব্যাংকে গড় ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩৩ হাজার টাকা। ১৪টি মন্ত্রণালয়ের ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পসমূহে এখন পর্যন্ত ৩৪৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ এখন পর্যন্ত পুঞ্জিভূত ভিত্তিতে ৭০০৫ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণ বিতরণে সহায়তা দেওয়ার জন্য পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনকে শক্তিশালী করা হয়েছে এবং ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী-২ এর আওতায় এই ফাউন্ডেশনের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা হতে ১৮.১ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি সমীক্ষা অনুসারে বেসরকারী সংস্থাসমূহ ইতোমধ্যে পুঞ্জিভূত ভিত্তিতে ১ কোটি ২ লক্ষ ঋণগ্রহীতার কাছে ১০,৯০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরন করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনও দরিদ্রদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী খাতে এত ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়নি। সরকারের এ সব উদ্যোগের ফলেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল দরিদ্র জনগণের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

১৬। প্রাকৃতিক সম্পদ বা ভৌত পুঁজি নয়, মানুষই হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। মানব সম্পদের উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য একই সাথে উন্নয়নের উপায় ও লক্ষ্য। গত পাঁচ বছরে মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ১৫ বছরের ও তদুর্ধ বয়স্কদের সাক্ষরতার হার ১৯৯৫ সালে ছিল ৪৭.৩ শতাংশ, ২০০০ সালে এই সংখ্যা ৬৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৬ শিক্ষা বর্ষে পাঁচ হতে চব্বিশ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের হার ছিল ৫০.১ শতাংশ, ১৯৯৮ শিক্ষা বর্ষে এই হার ৫৫.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে ছিল প্রতি হাজারে ৬৭, এই হার ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ৫৭ তে নেমে এসেছে। গত

পাঁচ বছরে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৩.১ বছর বেড়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য গত পাঁচ বছরে সরকার তিনটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রথমত, সামাজিক উন্নয়ন খাতে ব্যয় দ্রুত বাড়ানো হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ৫১৩৩ কোটি টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এই দুই খাতে সম্পূরক বাজেটে বরাদ্দ উন্নীত হবে ৮৪৬৯ কোটি টাকাতে। দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যাপক সংস্কারের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নীতি অনুমোদিত হয়েছে। এর আগে কোন সরকারের পক্ষে এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে নীতি চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। এ দুটি নীতির পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নও শুরু হয়েছে। সবশেষে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির শিক্ষা ও প্রয়োগের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কম্পিউটারের উপর সকল আমদানী শুল্ক ও কর প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

১৭। সামগ্রিক অর্থনীতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা টেকসই উন্নয়নের অবশ্য পূর্বশর্ত। মূল্যস্ফীতি শুধু প্রবৃদ্ধির অন্তরায়ই নয়, মূল্যস্ফীতি অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য নিয়ে আসে বেকারত্বের ও ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাসের নির্মম অভিশাপ। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস যথার্থই বলেছেন, "There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauch the currency" (একটি সমাজের বিদ্যমান ভিত্তি ধ্বংস করার জন্য মুদ্রা ব্যবস্থা নষ্ট করার চেয়ে সূক্ষ্মতর বা নিশ্চিততর কোন পদ্ধতি নেই)। বঙ্গবন্ধুও মূল্যস্ফীতিকে বাংলাদেশের তিনটি প্রধান শত্রুর মধ্যে প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। আমি তাই ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরের বাজেট বক্তৃতায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, "অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখার জন্য উপযুক্ত সামষ্টিক (macro) নীতিমালা অনুসরণ করা হবে"। পাঁচ বছর পর আমি আজ আনন্দের সাথে এই মহান সংসদকে জানাচ্ছি যে, দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্বিপাক সত্ত্বেও আমরা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছি। জুলাই ১৯৯৬ হতে মার্চ ২০০১ সময়কালে গড়ে বছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল মাত্র ৪.৫ শতাংশ। তবে গত দু বছরে মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। মাসিক মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে গড় মূল্যস্ফীতির হার হল মাত্র ১.৫৯ শতাংশ, প্রতিতুলনায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের হিসাব অনুসারে সকল উন্নয়নশীল দেশে ২০০০ সালে গড়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ছিল ৬.২ শতাংশ, ২০০১ অর্থ বছরে এই হার দাঁড়াবে ৫.২ শতাংশে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির গড় বাৎসরিক হার ছিল ৩.৪১ শতাংশ। সঠিক মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি অনুসরনের ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক ধ্বস, ১৯৯৮ সালের ধ্বংসাত্মক বন্যা ও সাম্প্রতিক জ্বালানি তেলের মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও গত দু বছরে মূল্যস্ফীতি অতি দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

১৮। সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য শুধু মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে রাখাই যথেষ্ট নয়, বৈদেশিক লেনদেনের স্থিতির বৃদ্ধিও অত্যাবশ্যক। বৈদেশিক লেনদেনের স্থিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার তিনটি প্রধান কৌশল অবলম্বন করেছে। প্রথমত, রপ্তানী

উৎসাহিত করার জন্য প্রত্যক্ষ ভর্তুকিসহ বিভিন্ন সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে দেশীয় উপকরণ ব্যবহারকারী তৈরী পোষাক শিল্প, নির্বাচিত প্রক্রিয়াজাত চামড়ার পণ্য, প্রক্রিয়াজাত পাটজাত পণ্য, ফুল, কৃত্রিম ফুল ইত্যাদি খাতে ৭৯৭ কোটি টাকার ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে দেশীয় রপ্তাণীকারকদের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, রপ্তানী উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক মূদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে নমনীয় নীতি অনুসরন করা হচ্ছে। দৈনিক তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণীত প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange rate) অনুসরন করে মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে। বর্তমান অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত মার্কিন ডলারের সাথে টাকার মূল্যমান দু'বার পরিবর্তন করা হয়েছে এবং প্রায় ১০.৫ শতাংশ অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। তৃতীয়ত, অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্যের উৎপাদন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে একটি সমমূলধন ও উদ্যোক্তা (Equity and Entrepreneurship Fund) তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সম্ভাবনাময় রপ্তানী শিল্পে এই তহবিলের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ফলে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি ও ব্যয় হ্রাস পাবে।

মাননীয় স্পীকার,

১৯। বর্তমান সরকারের প্রথম বাজেটেই আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে, দেশে উন্নয়নের চালিকাশক্তি হবে বেসরকারী খাত এবং সরকারের দায়িত্ব হবে উন্নয়নের পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি। এ প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে গত পাঁচ বছর ধরে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। চারটি স্পর্শকাতর খাত ছাড়া সকল খাত দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অবকাঠামো খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের একটি হিসাব অনুসারে গত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, গ্যাস ও বন্দর খাতে প্রায় ১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হয়েছে। উপরন্তু বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রথমত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় পুঁজি বাজার সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতোমধ্যে এ সম্পর্কে পাঁচটি আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিধি ও প্রবিধি জারি করা হয়েছে। এ সকল আইনগত সংস্কারের ফলে ও পুঁজি বাজারে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে এ বাজারের উন্নয়নের জন্য একটি মজবুত ভিত্তি রচিত হয়েছে।

২০। দ্বিতীয়ত, গত পাঁচ বছর ধরে ব্যাংক খাতে সংস্কার কর্মসূচী সুসংহত করা হয়েছে। স্বতন্ত্র ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করে, দেওলিয়া আইন জারি করে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি জোরদার করে, বিভিন্ন আইন সংশোধন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে ব্যাংকিং খাতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নৈরাজ্য প্রতিহত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে তফশিলী ব্যাংকসমূহের খেলাপি ঋণের স্থুল হার ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে ছিল ৪১ শতাংশ, এই হার ২০০০ সালের অনুরূপ সময়ে ৩৪.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংকসমূহের সঞ্চিতি ও রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে প্রাপ্য অর্থ বাদ দিলে খেলাপি ঋণের নীট হার (যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়) অনেক কম হবে।

২১। তৃতীয়ত, দেশীয় শিল্পের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে বাণিজ্য খাতে সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে আমদানীর উপর কার্যকর গড় বহিঃশুল্ক হার ছিল ১৭ শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে এ হার ১৩.৭ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে। কাঁচামালের উপর শুল্ক হ্রাসের ফলে দেশে শিল্পায়ন উৎসাহিত হয়েছে। চতুর্থত, প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য ইতোমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য প্রায় ২২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন সরকারের কাছে তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করেছে। এই কমিশনের সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হচ্ছে।

২২। চতুর্থত, দেশী ও বিদেশী সূত্র হতে শিল্পে বিনিয়োগের জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় অগ্রণী বন্ড এবং সমমূলধন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে রপ্তাণীমুখী শিল্পের জন্য অর্থায়নের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি কমিটির মাধ্যমে রুগ্ন শিল্পের সমস্যা স্থায়ী ভিত্তিতে সমাধান করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকারসমূহের অদূরদর্শী ও ভ্রান্ত নীতির ফলে সৃষ্ট এসব রুগ্ন শিল্প সংক্রান্ত জটিল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান বর্তমান সরকারকেই করতে হয়েছে। উপরন্তু বেসরকারীকরণ কর্মসূচীকে অভিজ্ঞতার আলোকে সংশোধন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেশে বিনিয়োগের অনুকূল একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্যবসায় সহায়ক (business friendly) নীতির সুফল বর্ধিত বেসরকারী বিনিয়োগের মাধ্যমে ইতোমধ্যে আমরা পেতে শুরু করেছি।

মাননীয় স্পীকার,

২৩। গত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান সরকারের গৃহীত নীতিমালা একই সাথে প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিতকরণে ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ফলপ্রসূ হয়েছে। আমাদের তাই দায়িত্ব হবে আগামী পাঁচ বছরে এ সকল নীতিমালার বাস্তবায়ন আরো জোরদার ও সুসংহত করা। তবু একই সাথে এ কথাও সুস্পষ্ট যে গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ যা অর্জন করেছে তার চেয়ে বেশি অর্জন করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হলে পুরানো জরাজীর্ণ শাসন ব্যবস্থাকে আমাদের সংবিধানের আদর্শ ও নীতিমালার আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। দ্রুত সংস্কার বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের অর্জন ও সম্ভাবনার মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করতে হবে। কাজেই পুনর্নির্বাচিত হলে ইনশাল্লাহ আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কার কর্মসূচীর কাজ শুরু করব। এ সব কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রশাসনে, রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহে, ব্যাংক ব্যবস্থায়, বাণিজ্য ব্যবস্থায় কার্যকর সংস্কার করা হবে। দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়নের জন্য অধিকতর সম্পদ সংগ্রহের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি রাজস্ব কমিশন গঠন করা হবে। উপরন্তু সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের সকল ব্যয় পর্যালোচনা করে সুপারিশ পেশ করার জন্য একটি সরকারী ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন (Public Expenditure Review Commission) স্থাপন করা হবে। উপরোক্ত দুটি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। তবে, সকল

সংস্কারই হবে আমাদের অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা কখনও বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া সংস্কার গ্রহণ করব না। উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরীর পরই জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কার বাস্তবায়ন করব।

মাননীয় স্পীকার,

২৪। আমি এখন ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের মূল অর্থনৈতিক প্রবণতাসমূহ তুলে ধরতে চাই। জাতীয় উৎপাদের প্রাক্‌কলন হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে কৃষি ও বন খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৪ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থ বছরে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯২। গত অর্থ বছরে কৃষি খাতে উৎপাদনের পরিমাণ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বর্তমান অর্থ বছরে প্রায় ৪ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধিকে নিঃসন্দেহে ঈর্ষণীয় সাফল্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে শিল্প খাতে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির হার হলো ৯.১ শতাংশ। এই হার গত পাঁচ বছরে শিল্পে প্রবৃদ্ধির সর্বোচ্চ হার। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ধ্বংসাত্মক বন্যার পর শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩.১৯ শতাংশে নেমে এসেছিল, ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরেও এই হার ৪.৭৬ শতাংশে সীমিত ছিল। ব্যাপক হারে কাঁচা মালের শুল্ক হ্রাস ও বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির ফলেই শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়েছে। নির্মাণ খাতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি হবে ৭.৯৩ শতাংশ যা ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধির হার হতে সামান্য কম (৮.৪৮%)। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে মৎস্য খাতে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির হার ৮.৪ শতাংশ, খনিজ দ্রব্য আহরন খাতে এই হার হলো ১০.৫৫ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে ৭.০২ শতাংশ, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতে ৬.২৫ শতাংশ, পরিবহন খাতে ৬.২৫ শতাংশ, ব্যাংক ও বীমা খাতে ৫.৬৮ শতাংশ ও স্বাস্থ্য খাতে ৪.৯১ শতাংশ। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে জাতীয় আয়ের সকল খাতেই ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ও কোন খাতেই প্রবৃদ্ধি ৩.০৯ শতাংশের কম হয়নি। সাময়িক প্রাক্কলন হতে দেখা যায় যে, ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার হবে যথাক্রমে স্থুল জাতীয় উৎপাদের ১৭.৮৮ শতাংশ ও ২৩.১ শতাংশ। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের এই হার ছিল ১৪.৯০ শতাংশ ও ২০.১৭ শতাংশ। সর্বশেষ প্রাক্কলন হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে স্থুল জাতীয় উৎপাদের ২৩.৬৩ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয়েছে; পক্ষান্তরে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে এই হার ছিল ১৯.৯৯ শতাংশ। বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারনের ফলেই গত পাঁচ বছর ধরে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

২৫। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে সামগ্রিকভাবে সতর্ক সম্প্রসারণশীল মুদ্রা নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালের বন্যায় সৃষ্ট মন্দার প্রেক্ষিতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে সম্প্রসারনমূলক মুদ্রা নীতি অনুসরণ করা হয়। বার্ষিক ভিত্তিতে এপ্রিল ১৯৯৯ হতে মার্চ ২০০০ সময়কালে ব্যাপক অর্থ (Broad Money) সরবরাহ ১৯.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এপ্রিল ২০০০ হতে মার্চ ২০০১ সময়কালে এই হার ১৫.৩৮ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে এই হার মাত্র ১০.৩১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

উপরন্তু, বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে সরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাই ১৯৯৯ - মার্চ ২০০০ সময়কালে সরকারী খাতে ঋণ বেড়েছে ৩৯.৪২ শতাংশ। অথচ ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে এই বৃদ্ধির হার ১৪.৯৩ শতাংশে নেমে এসেছে। জুলাই ১৯৯৯ - মার্চ ২০০০ সময়কালে বেসরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধি পায় মাত্র ৫.৭৮ শতাংশ, বর্তমান অর্থ বছরের অনুরূপ সময়ে এই হার ১০.৬৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৬। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ডলার মূল্যে রপ্তানী ১৫.৯২ শতাংশ বেড়েছে। ১৯৯৮ সালের বন্যার ফলে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে রপ্তানী বৃদ্ধির হার ৩.২ শতাংশে নেমে আসে, ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে এই হার ছিল ৮.২ শতাংশ। হিমায়িত খাদ্য, চামড়া, চা, বোনা পোষাক (Knitwear) এবং তৈরী পোষাকের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেখা যায়। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ায় পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানী হ্রাস পেয়েছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের প্রবৃদ্ধির হারের উঠানামা সত্ত্বেও বর্তমান অর্থ বছরে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১.৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে, আমদানী বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে প্রায় ১৭.৮ শতাংশ বেড়েছে। খাদ্যশস্যের আমদানী হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি, পেট্রোল ও পেট্রোলজাত পণ্যের ও শিল্পের কাঁচামালের আমদানী বৃদ্ধির ফলেই এ লক্ষণীয় বৃদ্ধি ঘটেছে। রপ্তানী উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বর্তমান অর্থ বছরের ২৪শে মে তারিখে মুদ্রার প্রায় ৫.২৬ শতাংশ অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। উপরন্তু, বর্তমানে রপ্তানীর জন্য প্রদত্ত সকল ভর্তুকি একই হারে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরেও চালু রাখার জন্য বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদেশে কর্মরত প্রবাসী নাগরিকগণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। তাদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ যারা বছরে এক লাখ, পঞ্চাশ হাজার বা বিশ হাজার ডলারের বেশি অর্থ দেশে পাঠাবেন, তাদের যথাক্রমে বিশেষ ভি,আই,পি কার্ড, গোল্ড কার্ড ও সিলভার কার্ড দেওয়া হবে। এই কার্ডধারী ব্যক্তিগণ বিনা কমিশনে ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাতে পারবেন, বিমান বন্দরে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবেন ও দেশের অভ্যন্তরে বিমান, রেলওয়ে ও সড়ক পরিবহণ সংস্থার টিকেট ক্রয়ে অগ্রাধিকার পাবেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধিমালা শীঘ্রই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা হবে।

মাননীয় স্পীকার,

২৭। আমি এখন ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের প্রধান বিশেষত্বসমূহ তুলে ধরছি। এই বছরের জন্য মূল বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২৪,১৯৮ কোটি টাকা, এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮,০০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য কর ও কর বহির্ভূত করের লক্ষ্য নির্ধারিত হয় ৬,১৯৮ কোটি টাকা। আমদানীর সন্তোষজনক বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক উন্নয়নের ফলে এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রকৃত আদায় লক্ষ্য-মাত্রার উর্দ্ধে রয়েছে। রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা বিবেচনা করে সংশোধিত বাজেটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্যমাত্রা ১৮,৩০০ কোটি টাকাতে পুনঃ নির্ধারন করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত

প্রতিষ্ঠানসমূহে লোকসান বৃদ্ধি ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর আদায়ের ঘাটতি বিবেচনা করে অন্যান্য কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব প্রাক্কলন ৬১৯৮ কোটি টাকা হতে হ্রাস করে ৫৮৭৩ কোটি টাকাতে পুনঃ নির্ধারন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ২৫ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি হবে। বর্তমান অর্থ বছরে সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ের স্থুল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৭৯৯ কোটি টাকা এবং নীট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৪০০ কোটি টাকা। বর্তমান বছরের প্রথম নয় মাসে ৪৫৫৯ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র ইতোমধ্যে বিক্রয় হয়েছে এবং এই সময়ে মোট নীট লক্ষ্যমাত্রা ২৪০০ কোটি টাকার বিপরীতে ইতোমধ্যে ২৮২২ কোটি টাকা জমা হয়েছে। সঞ্চয়পত্রের প্রকৃত বিক্রয়ের প্রবণতা বিবেচনা করে সঞ্চয়পত্র খাতে নীট ১১২৯ কোটি টাকার অতিরিক্ত প্রাপ্তি প্রাক্কলন করা হয়েছে। উপরন্তু মূলধন খাতে ব্যয় হ্রাস পাওয়াতে সঞ্চয়পত্রের অতিরিক্ত প্রাপ্তি সহ অভ্যন্তরীন মূলধন খাতে অতিরিক্ত প্রাপ্তি ১৩৯৭ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। ২৫ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি বাদে ১৩৭২ কোটি টাকার প্রাপ্তি বাড়বে।

মাননীয় স্পীকার,

২৮। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয় ১৯,৬৩৩ কোটি টাকা হতে ২০,৬৬২ কোটি টাকাতে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। রাজস্ব বাজেটে ব্যয় বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারন হলোঃ বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের জন্য সরকারী অনুদানের হার বৃদ্ধি (২৪৩ কোটি), রপ্তানী বৃদ্ধির ফলে দেশজ উপাদান ব্যবহারের জন্য তৈরী পোষাক শিল্পে ভর্তুকি বৃদ্ধি (২০০ কোটি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি (১৯০ কোটি), অভ্যন্তরীন সুদ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি (৩৭৮ কোটি) ও জাতিসংঘের দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় (নীট ১১৪ কোটি) ও বর্ধিত বেতনের ভিত্তিতে পেনসন (১৯৫ কোটি)। মূল বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৭,৫০০ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ লক্ষ্যমাত্রা ১৮,২০০ কোটি টাকাতে উন্নীত হয়েছে। জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও সংশোধিত বাজেটে ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে ঋণের পরিমান ৩৭৬৪ কোটি টাকাতে দাঁড়াবে; মূল বাজেটে এই ঘাটতি ৩৫১৪ কোটিতে প্রাক্কলন করা হয়েছিল। তবে গত দুবছরের অভিজ্ঞতা হতে প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের ব্যাংক ঋণের ফলে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। পক্ষান্তরে, এই ঘাটতি বৃদ্ধির ফলে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ যোগান দেওয়া সম্ভব হবে।

২৯। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের জন্য মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ২৭২৩৯ কোটিতে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের মূল বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ১২.৬ শতাংশ বেশী। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ২০৭৩০ কোটিতে নির্ধারন করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের মূল লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫.২ শতাংশ এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ১৩.৩ শতাংশ বেশী। উল্লেখ্য বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম দশ মাসে গত অর্থ বছরের প্রথম দশ মাসের তুলনায় রাজস্ব আদায় ২২.৪৮ শতাংশ বেড়েছে।

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ এবং কর ব্যতীত প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ৬৫০৯ কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থ বছরের মূল লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে মাত্র ৫ শতাংশ বেশি এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০.৮ শতাংশ বেশি।

মাননীয় স্পীকার,

৩০। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব ব্যয় ২২০৩৮ কোটিতে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই ব্যয় ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের মূল বাজেটের তুলনায় প্রায় ১২.২ শতাংশ বেশী এবং সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৬.৭ শতাংশ বেশী। পূঞ্জীভূত সরকারী ঋণের উপর প্রদেয় সুদের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে আত্তীকরণের ফলে এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য রাজস্ব বাজেটে প্রতি বছরই ব্যয় বৃদ্ধি পায়। তবে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে নৈমিত্তিক ব্যয় ছাড়াও জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের জন্য ২০০ কোটি টাকা এবং জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচনের জন্য ১৬০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বিশেষ বরাদ্দ বাদ দিলে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের রাজস্ব খাতে ব্যয় ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের মূল বাজেটের তুলনায় মাত্র ১০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি হবে।

৩১। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আয়তন ১৯০০০ কোটি টাকাতে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া উন্নয়ন বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য ৬২২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের মূল কর্মসূচীর তুলনায় ৮.৬ শতাংশ বেশি এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৪.৩৯ শতাংশ বেশি। প্রস্তাবিত বরাদ্দের ৫১.৩ শতাংশ আসবে বৈদেশিক সূত্র হতে এবং ৪৮.৭ শতাংশ আসবে অভ্যন্তরীন সূত্র হতে। অভ্যন্তরীন সূত্র হতে যে ৯২৫১ কোটি টাকা প্রদান করা হবে এর মধ্যে নীট রাজস্ব উদ্বৃত্ত হবে ৫২০১ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট অর্থ সরকারী বিভাগ ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের নিজস্ব আয়, সঞ্চয়পত্রসহ বিভিন্ন আমানত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে।

মাননীয় স্পীকার,

৩২। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাতওয়ারি সম্পদ বন্টনে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর উপর। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে খাদ্য কর্মসূচীসহ বিভিন্ন প্রকল্পে দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য মোট ৬৪৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অনুরূপ বরাদ্দ ছিল ৬০০৬.১০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এসব কর্মসূচীতে বরাদ্দ প্রায় ৭ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে দারিদ্র নিরসনের জন্য (যথা খয়রাতি সাহায্য, দুর্বল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও উন্নয়ন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য,

দরিদ্রদের গৃহায়ন, বয়স্কদের জন্য ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ও মহিলাদের জন্য ভাতা, পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে) ৩৮১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া উন্নয়ন বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাইরে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য পূর্বোল্লোখিত ৬২২ কোটি টাকার বরাদ্দও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের বরাদ্দ মিলে দারিদ্র নিরসনের জন্য ব্যয় হবে ১০৮৬৭ কোটি টাকা যা সরকারের মোট বাজেটের ২৬ শতাংশ।

মাননীয় স্পীকার,

৩৩। আমি প্রথমে কৃষি খাতের বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। যদিও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে স্থূল জাতীয় উৎপাদে কৃষি খাতের হিস্সা ক্রমেই কমছে তবু বাংলাদেশে এখনও কৃষি খাতই হচ্ছে প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ও পুষ্টির প্রধান উৎস। কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের মূল রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ ছিল ২৮৯ কোটি টাকা। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে আমি এ বরাদ্দ ১১ শতাংশ বাড়িয়ে ৩২২ কোটি টাকাতে নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দের বাইরে রাজস্ব বাজেটে ন্যায্য মূল্যে সার সরবরাহ করার জন্য ১০০ কোটি টাকার ভর্তুকির প্রস্তাব রয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে কৃষি খাতে তিনটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত, নিখুঁত মৃত্তিকা বিশ্লেষণ কৃষি উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। মৃত্তিকা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন সারের সঠিক মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব। তাই মাটির বিশ্লেষণের ফলাফল কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে সারের অপচয় রোধ হবে, উৎপাদন খরচ কমবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা হবে। দুর্ভাগ্যবশত দেশে মৃত্তিকা বিশ্লেষণ প্রধানত স্থায়ী গবেষণাগারে করা হয়ে থাকে। প্রতিটি ভূমিখন্ডের মাটি বিশ্লেষণ করতে হলে ভ্রাম্যমান গবেষণাগারের মাধ্যমে এই সুযোগ সরাসরি কৃষকদের পৌঁছে দিতে হবে। জরুরী ভিত্তিতে অবিলম্বে দশটি ভ্রাম্যমান গবেষণাগার চালু করার জন্য এ বছরের রাজস্ব বাজেটে ১৩.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। দ্বিতীয়ত, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর কৃষি ঋণের অভূতপূর্ব সম্প্রসারন করা হয়েছে। কিন্তু দেশের দুটি রাষ্ট্রায়াত্ত কৃষি ব্যাংকে প্রয়োজনের অনুপাতে মূলধন সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। কৃষি ঋণ কর্মসূচী জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বাজেটে মূলধন বৃদ্ধির জন্য দুটি কৃষি ব্যাংকের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। তৃতীয়ত, কৃষকদের আয় দ্রুত বাড়ানোর জন্য শাক সব্জীর রপ্তানী দ্রুত বাড়াতে হবে। দেশে বর্তমানে সুষ্ঠু প্যাকেজিং এর অভাবে শাক-সব্জীর রপ্তানী ব্যহত হচ্ছে। শাক-সব্জীর রপ্তানী উৎসাহিত করার লক্ষ্যে হরটেক্স (Hortex) ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্যাকেজিং এর জন্য ৪ কোটি টাকা সহায়তা দানের প্রস্তাব রাখছি। রাজস্ব বাজেটে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৩৪ কোটি টাকা। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে এই বরাদ্দ ১৫২ কোটি টাকাতে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৩৪।	২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে কৃষি খাতে মোট ৯৩৭.১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থ বছরে এই বরাদ্দ ছিল ৮৮৩.৯ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে জাতীয় কৃষি নীতি অনুমোদিত হয়েছে। নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় বীজ নীতির আলোকে বীজ (সংশোধন) আইন ১৯৯৭ অনুমোদন ও নতুন বীজ বিধিমালা প্রণয়ণ করা হয়েছে। সারের মান নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল সার আমদানী ও বিক্রয় বন্ধের লক্ষ্যে সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৯৯ জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় ১২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষি সেবায় উদ্ভাবন ও সংস্কার প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। ১৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষি বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণের জন্য ইফাদ (IFAD) এর সহযোগিতায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের বাস্তবায়ন এগিয়ে চলেছে। মৎস্য উপখাতে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন হচ্ছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের জন্য ৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইফাদের সহায়তায় ১০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ও ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের জন্য ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ঝাটকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের অর্থায়নে ৫১.৪৬ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে মৎস্য উৎপাদন দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে জাতীয় আয়ের প্রায় ৫% এবং দেশের রপ্তানী আয়ের প্রায় ৬ শতাংশ আসে মৎস্য উপখাত হতে। গবাদি পশুর উন্নয়নের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পশু সম্পদের উন্নয়নের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ১৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে অংশীদারীত্বমূলক পশু সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এগিয়ে চলছে। চারটি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

৩৫।	বাংলাদেশে এতদিন পর্যন্ত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য ছিল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কৃষি খাতে অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংস্পূর্ণ হওয়াতে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিও নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে গত দু'বছর ধরে সরকারের নিজস্ব অর্থে খাদ্যশস্য আমদানী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং অভ্যন্তরীন সংগ্রহের মাধ্যমে খাদ্য মজুত গড়ে তোলা হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীন খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টনে নির্ধারন করা হয়েছে। উপরন্তু, প্রতি মৌসুমে বাজার মূল্যের চেয়ে উচ্চতর হারে খাদ্যশস্যের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারন করা হচ্ছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ এবং বিদ্যমান গুদামসমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ এবং খাদ্য দপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনার আধুনিকীকরণের জন্য চারটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে খাদ্য উপখাতে ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০০০ সালের ৩০শে জুন খাদ্যশস্যের সরকারী মজুতের পরিমাণ ছিল ১০.৯২ লক্ষ টন, ২০০১ সালের ৩০শে জুন এই মজুতের পরিমাণ ৮.৪২ লক্ষ টনে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বাজেটে প্রস্তাবিত কর্মসূচী অনুসারে ২০০২ সালের ৩০শে জুন সরকারী মজুতের পরিমাণ ৯.৬৬ লক্ষ টনে উন্নীত হবে।

মাননীয় স্পীকার,

৩৬।	বাংলাদেশ পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহৎ মিঠা পানির উৎস। উপরন্তু, গোটা বাংলাদেশই হলো পরিবেশগত দিক হতে একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর জলাভূমি। অসংখ্য নদ-নদী এ দেশের ভূপ্রকৃতি গড়েছে এবং নিয়ত পরিবর্তন করে চলেছে। খেয়ালি নদনদী এ দেশের মানুষের জীবনের আশা-আনন্দ ও দুঃখ-বেদনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মৌসুমভেদে এদেশে পানি কখনও হয়ে ওঠে আশীর্বাদ, কখনও হয়ে ওঠে অভিশাপ। বাংলাদেশে প্রকৃতির এ রহস্যময় সমস্যাকে জটিলতর করে তোলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি। পূর্ববর্তী সরকারসমূহের ভারতের সাথে পানি বন্টনের দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থতা এ দেশে পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অলঙ্ঘনীয় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই শেখ হাসিনার সরকার গঙ্গার পানি বন্টনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করে দেশে পানি সম্পদ উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটে একত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রায় ১০৬১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে ৯০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। সরকারের পানি নীতির লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একটি আধুনিক জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে। হাওড়, বাওড় ও বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই বোর্ডের উদ্যোগে হাওড় ও জলাভূমির জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

৩৭।	আওয়ামী লীগ সরকারের বিঘোষিত নীতি অনুসারে বিগত পাঁচ বছর ধরে পল্লী অঞ্চলে অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছর সময়কালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৯৩৮২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। গত পাঁচ বছরে এই সংস্থা ২২,১৫৯ কিলোমিটার মাটির সড়ক নির্মাণ করেছে, ৯১৭৭ কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মাণ করেছে এবং ৭২৮টি প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র (growth centre) স্থাপন করেছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের জন্য ১১৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের ১১টি প্রকল্পের জন্য ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ১৫৮.৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত নেতৃত্বে পরিচালিত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের জন্য ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সামগ্রিকভাবে আগামী অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন খাতে ১৬৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, এই বরাদ্দ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মোট বরাদ্দের ৮.৬৮ শতাংশ।

মাননীয় স্পীকার,

৩৮।	মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল বেল (Daniel Bell) যথার্থই বলেছেন যে, আজকের বিশ্বায়িত অর্থ ব্যবস্থায় জাতীয় সরকার বড় বড় সমস্যা মীমাংসার জন্য অতি ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং ছোট ছোট সমস্যা সমাধানের জন্য অতি বড় হয়ে গেছে। জাতীয় সরকারের পক্ষে তৃণমূলের গভীরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই তৃণমূলে সমস্যার সমাধানের জন্য স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে

তুলতে হবে। আওয়ামী লীগ সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়নে ওয়াদাবদ্ধ। ইতোমধ্যে ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলা ও জেলা পরিষদের আইনগত কাঠামোও ইতোমধ্যে জারি করা হয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সকল স্তরে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা বাবদ ২২৫ কোটি টাকা, পৌরসভা উন্নয়ন সহায়তা বাবদ ১৩০ কোটি টাকা, জেলা পরিষদ বাবদ ৬০ কোটি টাকা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য ৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সচিবদের সরকারী অনুদানের হিস্সা ৫০ হতে ৭৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি এবং এর জন্য রাজস্ব বাজেটে ৫.৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের সংস্থান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব বাজেটে ১০.৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। উপরন্তু ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য সরকারী অনুদান বাবদ এক কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী কার্যক্রমের সম্পূরক ও পরিপূরক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার বেসরকারী ও সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহকে গত পাঁচ বছর ধরে আন্তরিক সমর্থন করেছে। ভবিষ্যতে এ সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

মাননীয় স্পীকার,

৩৯। প্রায় সত্তর বছর আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুঃখ করে লিখেছিলেন, "আমাদের মাতৃভূমিকে সুজলা সুফলা বলে স্তব করা হয়েছে। কিন্তু এই দেশেই যে জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র, পঙ্কবিলীন-যে করে আরোগ্য বিধান সে আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্য ক্ষেত্রে। সমস্ত দেশ হয়ে উঠেছে তৃষ্ণার্ত, মলিন, রুগ্ন, উপবাসী"। গত সত্তর বছরে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে পরিবেশ দূষণের সমস্যা বাংলাদেশের অজস্র বিপন্ন জনপদে আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। বাজেটে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রধানত তিনটি এলাকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রথমত, সুন্দরবন ও সেন্ট মার্টিন দ্বীপে জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে এ দুটি প্রকল্পের জন্য ৪৪.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। দ্বিতীয়ত, পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে প্রায় ৩১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে তিনটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে এ তিনটি প্রকল্পের জন্য ৭৫.৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। তৃতীয়ত, বায়ু দূষণ হ্রাসের জন্য দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় বায়ুর মান ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জন্য ৬.৭৮ কোটি টাকা এবং বায়ু দূষণ রোধে সিএনজি প্রকল্পের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। উপরন্তু ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে ঢাকা শহরে অটোরিকশা কর্তৃক নির্গত বায়ু দূষণ হ্রাস করার লক্ষ্যে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিশেষ জরুরী কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব করছি। এই কার্যক্রমের অধীনে যে সব অটোরিকশায় জ্বালানী হিসাবে ডিজেলের পরিবর্তে সিএনজি ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রূপান্তর করা হবে তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে এবং সিএনজি র সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাননীয় স্পীকার,

৪০। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে পরিবহণ খাতকে সর্বাধিক বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন একই সাথে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিগত পাঁচ বছর ধরে যোগাযোগ খাতে সরকারের বিনিয়োগের ফলে দেশের ভৌত অবকাঠামোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নির্মাণ সম্পূর্ণ করে শেখ হাসিনার সরকার ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি অঞ্চলকে একত্রিত করার দীর্ঘদিনের লালিত জাতীয় স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছে। গত পাঁচ বছরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উদ্যোগে প্রায় ৩৭২০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ২১৬০ কিলোমিটার ইট বিছানো রাস্তা এবং ৩৭৬৬ কিলোমিটার সড়ক বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এই সময়ে নির্মিত সেতুসমূহের মোট দৈর্ঘ্য হলো ১৩,৮১৩ মিটার ও বেইলি সেতুর মোট দৈর্ঘ্য ২৬,৩৭৫ মিটার। গত ২০শে মে তারিখে ১৪৭৯ মিটার দৈর্ঘ্যের দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতু সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ও স্থানীয় প্রযুক্তির ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে। দেশীয় প্রকৌশলীরা এত বড় কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করে দেশীয় কারিগরি যোগ্যতার উৎকৃষ্ট উদাহরন সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের আমলে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পাকশীতে পদ্মা নদীর উপর জাপানী সহায়তায় ৪১০.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী সেতু, মেঘনা নদীতে ভৈরব বাজারে ব্রিটিশ সহায়তায় ৪৫৩ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু, জাপানী সহায়তায় খুলনায় রূপসা সেতু, বরিশালে চীনা সহায়তায় গাবখান সেতু, ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কে কুয়েতি সহায়তায় শিকারপুর-দোয়ারিকা সেতু, নিজস্ব অর্থায়নে কুড়িগ্রামে ধরলা সেতু এবং তৈলার দ্বীপে সাংগু সেতু। পদ্মা সেতুর অর্থায়নের জন্য ইতোমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে পরিবহণ খাতে ৩৪০৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে সড়ক ও জনপথ বিভাগের জন্য ২২৯০.১ কোটি টাকা, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য ১০০ কোটি টাকা, বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৬৯৬.৫ কোটি টাকা ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের জন্য ১০৫.২৫ কোটি টাকার বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ছাড়া নৌ পরিবহণ খাতে ৩৪২.৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ঢাকা শহরের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তা পুষ্ট ঢাকা নগর পরিবহণ প্রকল্পের জন্য ৫১.৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়কসমূহ মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৪১। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে যোগাযোগ খাতে ৬৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৪৪ কোটি টাকা ব্যয়িত হবে টেলিফোন খাতে এবং অবশিষ্ট বরাদ্দ ডাক বিভাগ ও আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক ব্যবহৃত হবে। আগামী অর্থ বছরে বিভিন্ন জেলা শহরে ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য ৩৭৩.৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে নতুন জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা ঘোষিত হয়েছে। টেলিযোগাযোগ খাতে বেসরকারী

বিনিয়োগের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে ৪টি বেসরকারী ভ্রাম্যমান সেলুলার টেলিফোন প্রতিষ্ঠানকে দেশে টেলিফোন সেবা বিপনণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায় ২ লক্ষ ৭৮ হাজার গ্রাহককে নতুন টেলিফোন সংযোগ দিয়েছে। এছাড়া পল্লী অঞ্চলে আরো দুটি বেসরকারী টেলিফোন প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগে টেলিফোন সেবা প্রদানের ফলে টেলিফোনের মাসুলও কমে এসেছে। টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির নাটকীয় উন্নয়নের ফলে সারা বিশ্বে টেলিফোনের মাসুল কমছে। টেলিফোন সেবার আন্তর্জাতিক বাজারে সাম্প্রতিক প্রবণতার সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ড ''নেশন ওয়াইড ডায়ালিং'' এর মাসুল ও দেশীয় গ্রাহকদের জন্য আন্তর্জাতিক টেলিফোনের মাসুল হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, এই হার ১লা জুলাই ২০০১ থেকে কার্যকর হবে। নতুন হার অনুসারে দেশীয় গ্রাহকদের জন্য এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলে টেলিফোনের হার ৭.৪ শতাংশ হতে ১৪.২৯ শতাংশ কমে যাবে। আমেরিকা ও ইউরোপের জন্য কমবে ১৬.৬৭ শতাংশ ও সার্কভুক্ত দেশের ক্ষেত্রে কমবে ১৪.২৯ শতাংশ। ''নেশন ওয়াইড ডায়ালিং'' এর জন্য বর্তমানে দূরত্বভেদে মাসুলের পাঁচটি স্তর রয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০১ তারিখ হতে এ মাসুলের হার তিনটি স্তরে হ্রাস করা হবে এবং মাশুল ১৩.৪ শতাংশ হতে ৩৬ শতাংশ হ্রাস পাবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে জারি করা হবে। টেলিফোন কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে এই মাসুল কমে যাওয়া সত্ত্বেও টেলিফোন বোর্ডের স্থূল প্রাপ্তি অপরিবর্তিত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার,

৪২। উত্তরাধিকার সূত্রে আওয়ামী লীগ সরকার একটি বিপর্যস্ত বিদ্যুৎ খাত লাভ করে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে দেশে বিদ্যুতের কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২১০৫ মেগাওয়াট। গত পাঁচ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩১০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে যা বর্তমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে সক্ষম। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ছিল ৯২ কিলোওয়াট ঘন্টা, যা ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ১২০ কিলোওয়াট ঘন্টায় উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে বেসরকারী খাতে ১১৮৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মধ্যে ৫৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। বর্তমানে বেসরকারী খাতে ৮১৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। এছাড়া বৈদ্যুতিক জেনারেটর আমদানীর উপর শুল্ক ও ভ্যাট মওকুফের সুবিধা প্রদানের ফলে বেসরকারী খাতে প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট স্থির বিদ্যুৎ (captive power) উৎপাদিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ২২৪৯.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে ৫৯৯ কোটি টাকা পল্লী বিদ্যুৎ উপখাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিদিন প্রায় ৭টি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ করছে। বর্তমান সরকারের আমলে ইতোমধ্যে ১৩,৭১৩টি গ্রামে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে এবং ৩২ হাজার নতুন সেচ পাম্প সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ খাতকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়ন চলছে।

৪৩। তেল, গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গ্যাস সম্পদের দ্রুত অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সারা দেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করে ব্লকসমূহকে উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পি এস সি) এর আওতায় দেশী ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ১৫টি ব্লকের জন্য ইতোমধ্যে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, বিদেশী বিনিয়োগের ফলে দেশে গ্যাস উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৩২.৩০ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের জুলাই-জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ছয় মাস সময়কালে গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২১৩ বিলিয়ন ঘনফুট। তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৪৪০.০২ কোটি টাকা যা ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটে ৬৫৩.২৫ কোটি টাকাতে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬৯ কোটি টাকা ব্যয় হবে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্পের জন্য, ৯৯.৬ কোটি টাকা নির্ধারিত রয়েছে বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির উন্নয়নের জন্য এবং ১১৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হবে তৃতীয় প্রাকৃতিক গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্পে।

মাননীয় স্পীকার,

৪৪। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল এ দেশের মেহেনতি ও সৃজনশীল জনশক্তি। একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই এ বিশাল জনশক্তিকে দ্রুত উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা খাতে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে মোট ৬০২৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা হচ্ছে সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন বরাদ্দের ১৪.৬৯ শতাংশ। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৫২২ কোটি টাকা। গত পাঁচ বছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ৬৬ শতাংশ বেড়েছে। শিক্ষকরাই হচ্ছে মানুষ গড়ার কারিগর। তাই বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন সহায়তার পরিমাণ দ্রুত বাড়ানো হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য সরকারী বেতন সহায়তার পরিমাণ ১৪৭৭ কোটি টাকাতে নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রায় ১৪০৫ কোটি টাকা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রায় ৭১৮ কোটি টাকা, কারিগরি শিক্ষার জন্য ১০৭.৭৪ কোটি টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য ৮১.৫ কোটি টাকর বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত অর্থ বছরের মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বেড়েছে ৪.৮ শতাংশ; কারিগরি শিক্ষা খাতে ২৭.৯ শতাংশ; বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে ২.৮ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পুরাতন জেলা সদরে বারটি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিভাগীয় সদরে তিনটি নতুন মহিলা পলিটেকনিক স্থাপনের জন্য ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিদ্যমান ২০টি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণ ও ১৫টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য ২১.৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৩টি নতুন পেশাদারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (Vocational Training Institute) স্থাপন এবং প্রতিটি

উপজেলায় নির্বাচিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তনের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই দুটি প্রকল্পের জন্য ৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তির জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে উপবৃত্তির জন্য ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। উপরন্তু ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জন্য আগামী অর্থ বছরে ১৮.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য ১৪.২৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

মাননীয় স্পীকার,

৪৫। স্বাস্থ্য সেবাকে ব্যাপকভাবে জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাতে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচীর আওতায় ১৫ হাজার ৫ শত কোটি টাকার একটি ব্যাপক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য রাজস্ব বাজেটে ১২৫২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এই বরাদ্দ বর্তমান অর্থ বছরের মূল বরাদ্দের চেয়ে ১২.৫৯ শতাংশ বেশি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য আগামী অর্থ বছরে ১৬২১.৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা বর্তমান অর্থ বছরের মূল বরাদ্দের চেয়ে ২.৮ শতাংশ বেশি। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৬১১ কোটি টাকা। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে এ বরাদ্দ ২৮৭৩.৪ কোটিতে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। গত পাঁচ বছরে হাসপাতালে ৫৪০৫টি শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, ১৩২২ জন ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে এবং আরো ১১৮২ জন ডাক্তারের নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর ৪৪ হাজার কর্মকর্তা ও কর্মচারী দীর্ঘ দিন ধরে উন্নয়ন বাজেটে অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করছিলেন। এদের স্থায়ী ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪ হাজার নতুন নার্সের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ৬৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হল শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে বিদ্যমান অপুষ্টি কমিয়ে আনা। উপরন্তু প্রায় ৩৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে AIDS রোগের বিস্তার রোধ করার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

৪৬। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন খাতে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ১৪৬৬.৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জন্য ৩১৬.৮৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে। প্রায় ১৮০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে শেরে বাংলা নগরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ২০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের জন্য বিশেষ এপার্টমেন্ট বাস্তবায়ন প্রকল্পের জন্য আগামী অর্থ বছরে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ৩৪৭.৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাবও এ বাজেটে রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা নগর পরিবহণ প্রকল্পে ১৯২ কোটি টাকা ব্যয়িত হবে।

৪৭। শিল্প খাতে তিনটি নতুন সার কারখানা স্থাপন, দুটি সার কারখানা পুনর্বাসন ও একটি কাগজ মিলের পুনর্বাসনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থার উদ্যোগে গৃহীত এই ছয়টি প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৭৩.৭১ কোটি টাকা। ২৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মংলা, ঈশ্বরদী, কুমিল্লা ও সৈয়দপুরে চারটি রপ্তানী প্রক্রিয়া করণ অঞ্চল স্থাপন প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে এ চারটি প্রকল্পের জন্য ৫০.৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে শিল্প খাতে ৩৫৬.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৫.৭৫ কোটি টাকা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের জন্য বরাদ্দ করা হবে। এই খাতে বরাদ্দ দিয়ে আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। সিরাজগঞ্জ ও নরসিংদীতে শিল্প পার্ক, নারায়নগঞ্জে হোসিয়ারী শিল্প নগরী এবং চকরিয়াতে মৎস্য ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প নগরী স্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা খাতে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৯১ কোটি, গণ সংযোগ খাতে ৭৪.১০ কোটি টাকা এবং জন প্রশাসন খাতে ২০৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। শ্রম ও জনশক্তি খাতে মূলতঃ কারিগরি প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ১৯.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

৪৮। আওয়ামী লীগ সরকারের অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতার ফলে দেশব্যাপী যুব ও ক্রীড়া জগতে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গত পাঁচ বছরে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০০ সালের ২৬শে জুন বাংলাদেশ ক্রিকেটে টেষ্ট খেলার মর্য্যাদা লাভ করে এবং বিশ্বের ১০ম টেষ্ট খেলুড়ে দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদরা বিশেষ অলিম্পিক ৯৯ এ অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিভিন্ন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যাপক প্রসার এবং নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রীড়া মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৪৯। বাংলাদেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ তরুণ ও যুবক। জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুব সমাজের সম্পৃক্তকরণ এবং যুব সমাজকে মানব সম্পদে পরিনত করার লক্ষ্যে সরকার প্রশিক্ষিত যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত ও পুঁজির অভাব দূর করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যুব ও ক্রীড়া খাতে আগামী অর্থ বছরে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটে মোট ১৭১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে ক্রীড়া প্রশিক্ষণের উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৬.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব এবং রাজস্ব বাজেটে সাফ গেমস এর প্রস্তুতি ও অংশ গ্রহণের জন্য দুই কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

৫০।	বর্ণাঢ্য ও সুপ্রাচীন সংস্কৃতি বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বাকে সংজ্ঞা ও রূপ দিয়েছে। ভাষার জন্য বাঙ্গালী জাতির সর্বোচ্চ ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ ইউনেস্কো ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এ বছরে সারাদেশে মাস ব্যাপী কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়েছে। ঐতিহাসিক মুজিবনগরে সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্ত। জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর স্মৃতি চিরজাগ্রত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের টুঙ্গিপাড়াস্থ পৈত্রিক বাড়ি সংলগ্ন সমাধিস্থলে স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বেগম রোকেয়া স্মৃতি সৌধ ও মতিউর স্মৃতি কেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলা ও থানা পর্যায়ে গণ গ্রন্থাগার স্থাপন ও শিল্পকলা একাডেমী নির্মাণের কাজ চলছে। দেশের গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষার্থে প্রাচীন মসজিদ, মন্দির, বৌদ্ধ মন্দির সমূহ সংরক্ষণের কর্মসূচী অব্যাহত আছে। চলতি বছরে সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৩৭টি উন্নয়ন প্রকল্প ৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আগামী (২০০১-২০০২) অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৪২টি উন্নয়ন প্রকল্পে ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হল।

মাননীয় স্পীকার,

৫১।	দুর্বল ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ সরকারের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। তাই বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে সমাজ কল্যাণ ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ দ্রুত বাড়ানো হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ১০৬.৭২ কোটি টাকা। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে এই বরাদ্দ ২৭৯ কোটি টাকাতে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ৪৫.৬২ কোটি টাকা। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে এ বরাদ্দ ৯০ কোটি টাকাতে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের বরাদ্দের মধ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রবর্তিত তিনটি বিশেষ ভাতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বয়স্ক ভাতার জন্য ব্যয় হবে ৫০ কোটি টাকা, দুস্থ মহিলাদের ভাতা বাবদ ব্যয় হবে ২৫ কোটি টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বাবদ দেওয়া হবে ২৮.৮ কোটি টাকা। এর আগে কোন সরকারই এত ব্যাপক হারে অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেনি। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহিলাদের আইনগত নিরাপত্তার সহায়তা ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয় করে থাকে। তবে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম প্রায় সকল উন্নয়ন মন্ত্রণালয় হতে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মহিলাদের প্রত্যক্ষ উন্নয়নের জন্য ১৭৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৭টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

৫২। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের আধুনিকায়ন ও দক্ষতার মান উন্নয়নের জন্য বাহিনীসমূহকে যুগোপযোগীভাবে সুসজ্জিতকরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। বর্তমান সরকার প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ (National Defence College), বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার জন্য সামরিক ইনস্টিটিউট (Military Institute of Science and Technology) এবং সেনাবাহিনী মেডিকেল কলেজ (Armed Forces Medical College) স্থাপন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের কর্তব্য নিষ্ঠা ও দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম সেনা সরবরাহকারী দেশের মর্য্যাদা লাভ করেছে। বর্তমানে ৮৬২২ জন সেনাবাহিনীর সদস্য জাতিসংঘের দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন। সেনা সদস্যদের কর্তব্য নিষ্ঠার এ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি একদিকে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে অপরদিকে বৈদেশিক মুদ্রার অর্জন বাড়িয়েছে। সেনাবাহিনী আশ্রয়ন প্রকল্প, সড়ক নির্মাণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন উদ্ধারকার্য, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রমে বেসামরিক প্রশাসনকে যে সহায়তা প্রদান করছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের সামগ্রিক ভূমিকা ও ন্যায্য চাহিদা বিবেচনা করে প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের চলতি বছরের নীট মূল বরাদ্দ ৩২০৭ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে সংশোধিত বরাদ্দ ৩৩২০ কোটি টাকায় নির্ধারণ এবং ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের জন্য মোট ৩৪৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৫৩। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা হতে দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে আইন শৃঙ্খলা প্রশাসনের দায়িত্ব জটিলতর ও ব্যাপকতর আকার ধারন করে থাকে। দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে আওয়ামী লীগ সরকার তাই পুলিশ বাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরনের উদ্যোগ গ্রহন করে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সংশোধিত রাজস্ব বাজেটে পুলিশ খাতে বরাদ্দ ছিল (রেশন ছাড়া) ৫১৮.৬৭ কোটি টাকা, এই বরাদ্দ ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ৮৪৫.৩৩ কোটি টাকাতে নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশ রাইফেলের জন্য ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ৩৫৩.৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এই বরাদ্দ বর্তমান অর্থ বছরের মূল বরাদ্দ হতে ৫ শতাংশ বেশি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ দাঁড়াবে ১৬১৮ কোটি টাকায়। উপরন্তু ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে দমকল ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরের জন্য ১১ কোটি, পুলিশের জন্য ১১.৫ কোটি ও কারা অধিদপ্তরের জন্য ২১.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

৫৪। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের ইতিহাসে কূটনৈতিক সাফল্যের এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশসমূহে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের এক নতুন আবহ রচিত হয়েছে। গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি ও পার্বত্য চট্ট গ্রাম শান্তি চুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সমন্বয়কারীর মর্যাদা লাভ করেছে, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বিমসটেক আঞ্চলিক ফোরাম ও ৮ সদস্য বিশিষ্ট ডি-৮ ফোরাম স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইউনেস্কো শান্তি পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে ঐতিহাসিক ঢাকা নগরে ত্রয়োদশ জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের জন্য ২০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ সহ ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের জন্য ৩৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৫৫। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন, ‘‘দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপন দেশ হয় না’’। দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করে অমিততেজ মুক্তি যোদ্ধারা নিজের শক্তিতে বাংলাদেশকে আমাদের আপন করেছেন। তাদের পরম আত্মত্যাগ ও জ্বলন্ত দেশপ্রেম বাঙালী জাতিকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করবে। দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সমর্থন প্রদান একটি পবিত্র জাতীয় দায়িত্ব। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে মুক্তিযোদ্ধাদের মর্য্যাদার সাথে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে গৃহীত এক কর্মসূচীর অধীনে ৪২ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে মাসিক ভাতা দেওয়ার জন্য পনের কোটি টাকার একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে এ কর্মসূচী সম্প্রসারণের প্রস্তাব করছি এবং ৮০ হাজার দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের সহায়তা করার লক্ষ্যে ২৮.৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। উপরন্তু, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাজেট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৬.৬ কোটি টাকা, ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে এ বরাদ্দ ১৬.২৫ কোটি টাকাতে নির্ধারণের প্রস্তাব রাখছি। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য সরকারের সর্বমোট বরাদ্দ ৪৫.০৫ কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

মাননীয় স্পীকার,

৫৬। মুক্তিযুদ্ধ একটি আদর্শভিত্তিক সংগ্রাম। ব্যক্তির মৃত্যু হয়, জাতির উত্থান পতন ঘটে, কিন্তু আদর্শ অবিনশ্বর। আদর্শের কোন দিন মৃত্যু হয় না। মুক্তিযুদ্ধ তাই বাংলাদেশে একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া- এর কোন দিনই শেষ হবে না। এ চেতনার অনির্বাণ শিখা চিরদিন আমাদের শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছি। কিন্তু অভ্যন্তরীন ও

বাইরের শত্রুদের হীন ষড়যন্ত্র আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এ সংগ্রামকে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গত পাঁচ বছরে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছি। কিন্তু এ সাফল্যে আমাদের আত্মতৃপ্ত হলে চলবে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের বার বার ভেতরের ও বাইরের শত্রুদের রুখে দাঁড়াতে হবে। প্রয়াত মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক জন এফ কেনেডির ভাষায় তাই সকলকে এ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য ডাক দিয়ে যাইঃ “Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, ... but as a call to bear the burden of a long twilight struggle, a struggle against the common enemies of man - tyranny, poverty, disease and war itself” (আবার শিঙ্গার ধ্বনি আমাদের ডাকছে, অস্ত্র তুলে নেওয়ার জন্য নয় যদিও অস্ত্রের প্রয়োজন আমাদের রয়েছে ... ডাকছে প্রদোষলগ্নের দীর্ঘ মেয়াদি সংগ্রামে, - দুঃশাসন, দারিদ্র, ব্যাধি এবং যুদ্ধের মত সকল মানুষের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য)।